বিবর্তনের আলোকে প্রেম

- অপার্থিব (aparthib@yahoo.com)

ডারুইনের “প্রজাতির উৎস(Origin of Species)’’ আর “মানুষের উৎপত্তি(The Descent of man)’’ বই দুটি প্রকাশিত হবার পর থেকে আজ অবধি ডারুইনের সেই মূল তত্ত্বকে ভিত্তি করে ও নূতন সাক্ষ্য প্রমাণ আর পর্যবেক্ষণলব্ধ জ্ঞান এর দ্বারা সেই তত্ত্বকে পরিশীলিত ও সংশোধিত করে মানব প্রকৃতিকে বোঝার চেষ্টায় জীববিজ্ঞানীরা অনেক দূর এগিয়ে গেছেন। প্রেম কি?, মানব নৈতিকতার উৎস কি?, ইত্যাদি সনাতন প্রশ্নের উত্তর এখন অনেকটা পরিষ্কার হয়ে আসছে সমাজজীববিজ্ঞানী আর বিবর্তনী মনোবিজ্ঞানীদের গবেষণার বদৌলতে, বিষেশ করে উনবিংশ শতকের শেষ দুই দশকে। তাঁদের গবেষণা মানব অনূভুতির সকল দিকেরই কারণ হিসেবে আমাদের বৈবর্তনিক ইতিহাসের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করছে। অন্য সব অনূভুতির মত প্রেমানূভুতির মূলও বিবর্তনে নিহিত। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে বিবর্তনী মনোবিজ্ঞানীরা প্রেম শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করে ভালবাসার অনভূতি,সঙ্গী নির্বাচনের কৌশল, যৌনমিলন কেও এর অন্তর্ভুক্ত করেন, প্রসংগ অনুযায়ী যখন যেটা প্রযোজ্য হয়। আমি এই প্রবন্ধে বিজ্ঞানীদের গবেষণালব্ধ জ্ঞানের আলোচনাই করব বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে, বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান লেখকদের লেখা বই থেকে চয়ন করে আর সেগুলোর নির্দেশিকা দিয়ে। এছাড়া টিভির কিছু প্রোগ্রামের ও উল্লেখ করব।

বিবর্তনী মনোবিজ্ঞানের উপর বিশারদদের দ্বারা বেশ কিছু ভাল বই ও প্রবন্ধ লেখা হয়েছে। অনেকের মধ্যে ডেভিড বুস (David Buss), হেলেন ফিশার(Helen Fisher),জেফ্রী মিলার(Geoffrey Miller), রবিন বেকার(Robin Baker), লীডা কস্‌মীড্‌স(Leda Cosmides), জন টুবী(John Tooby), ম্যাট রিড্‌লী(Matt Ridley), ভিক্টর জন্সটন(Victor Johnston প্রমুখদের নাম করতে হয়। এছাড়া টিভি প্রোগ্রামের মধ্যে The Science of Sex, Gender Wars (Desmond Morris) ইত্যাদির নাম করা যায়।

প্রশ্ন হচ্ছে প্রেম কি? রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করেছিলেন “সখী ভালবাসা কারে কয়?” বিখ্যাত মার্কিন গীতিকার কোল পোর্টার জিজ্ঞেস করেছিলেন “প্রেম বস্তুটি কি?(What is this thing called love?”। তাঁরা কি কস্মিনকালেও ভাবতে পেরেছিলেন তাঁদের এই প্রশ্নের কি উত্তর অপেক্ষা করছে তাঁদের মৃত্যুর অনেক পরে বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে? বিবর্তন বিজ্ঞানের প্রজ্ঞার বদৌলতে প্রেমেরএক সন্তোষজনক ব্যাখ্যা সম্ভব। তবে বলে রাখি সঠিক অর্থে সংজ্ঞা বা ব্যখ্যা নয়, প্রেমের উৎস জানাটাই মূল কথা। সংজ্ঞা ব্যক্তিনির্ভর, সংজ্ঞার দ্বারা জ্ঞান বা উপলব্ধি সৃষ্টি হয় না বৃদ্ধি হয় না। প্রেম একটা অনুভূতি। এর সংজ্ঞার প্রয়োজন নেই। আমরা সবাই সবুজ রঙের অনুভূতি সম্পর্কে সচেতন। এর সংজ্ঞা দেয়ার অর্থ হয়না। তবে এই সবুজ অনুভূতির একটা কার্যকারণগত ব্যখ্যা দেয়া যায়। একটা জিনিষের রঙ তখনি আমরা সবুজ বলি যখন তার দ্বারা প্রতিফলিত আলোর তরংগদৈর্ঘ্য একটা বিশেষ মান হয়। এতে কোন ব্যক্তি নির্ভরতা নেই। প্রেমের অনুভূতিও সেরূপ অবিতর্কিত, সার্বজনীন, যার সংজ্ঞার প্রয়োজন হয় না। প্রেমেরও (সঠিক ভাবে প্রেমানুভূতির) অনুরূপ ভাবে একটি ব্যক্তিনিরপেক্ষ, কার্যকারণগত উৎস খোঁজার চেষ্টা করছে বিবর্তন মনোবিজ্ঞান।

তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে প্রেমানুভূতির মূল উৎস বা কারণ কি? উত্তরটি আশ্চর্য্যজনকভাবে সরল। বংশাণু উদ্বর্তনের (Survival of the Genes) তাগিদই এর আদি কারণ। বৃহত্তর চিত্রে এই বংশাণু উদ্বর্তনের তাগিদ প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural Selection) ও পরিব্যক্তি(Mutation)র সমন্বয়ে বিবর্তনের প্রকৃয়া সৃষ্টি করে যা শুধু প্রেমানুভূতিই নয়, মানুষের সব অনুভূতি ও আচরণের জন্ম দেয় আরও মৌলিক ধাপে গেলে বলতে হয় সব কিছুর আদি কারণ হল পদার্থবিজ্ঞানের সূত্র যা সকল ভৌত ও জৈব প্রক্রিয়ার পেছনে চালিকা শক্তি হিসেবে বিরাজ করে। আমরা যখন একটা প্রেমের কবিতা পড়ি বা গান শুনি তখন হয়ত পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রের এই মৌলিক ভূমিকাকে দেখতে পাইনা। জীববিজ্ঞানী লীন মার্গুলিস ও ডরিয়ান সেগান তাঁদের লেখা বই "Mystery Dance: On the Evolution of Human Sexuality" এর ৪৬ পৃঃ এ লিখেছেনঃ

“All our desires, passions etc, reflect inanimate tendencies already implicit before life in the second law of Thermodynamics. Sexual reproducers, living beings making more of them - selves, achieve not only biological ends, but those of physics as well“

(আমাদের সকল বাসনা, আবেগ ইত্যাদি আসলে এক অজৈবিক প্রবণতার প্রতিনিধিত্ব করে, যা প্রাণ সৃষ্টির পূর্বেই তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রে প্রচ্ছন্ন আছে। যৌন প্রজনকেরা, অর্থাৎ প্রাণীরা, যারা নিজেদের প্রতিলিপি তৈরী করে, তারা জীববিজ্ঞানের নিয়মকেই শুধু মেটাচ্ছে না, পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মকেও)

বংশাণুর উদ্বর্তনের জন্য যে কোন প্রাণীর জন্য প্রয়োজনীয় হল ১) প্রজননে সক্ষম বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকা এবং ২) যৌন সঙ্গী বেছে নিয়ে পরের প্রজন্মে নিজের বংশাণু প্রেরণ করা। এই দ্বিতীয় ধাপেই প্রেম বা সঠিক ভাবে বলতে গেলে প্রণয়াকাংখা ও পাণিপ্রার্থনার(Courtship) উৎস নিহিত। ডারুইন এই বিষয়ের উপর কিছুটা আলোকপাত করেছিলেন “মানুষের উৎপত্তি” বইটিতে। কিন্তু এর বিশদ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় সমসাময়িক বৈবর্তনিক মনোবিজ্ঞানে। এই বিজ্ঞানের দ্বারা আমরা জানতে পারি যে নর ও নারীর বিশেষ কতকগুলি যোগ্যতার আকর্ষণে পরস্পরকে যৌন নির্বাচনের (Sexual Selection) মাধ্যমে বেছে নেয়, যার ফলে কোন কোন মানব বৈশিষ্ট্য যেমন মস্তিষ্কের আয়তন বৃদ্ধি, যৌনাঙ্গের বৈশিষ্ট্য এবং সাধারণভাবে পুরো মানব স্বভাবের বিবর্তন ঘটেছে। আধুনিক কালের পাণিপ্রার্থণার কতকগুলি কৌশলের আনুরূপ কৌশল বিবর্তনের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়,যেমন ময়ূরের লম্বা পুচ্ছাস্থি, যা ক্রমশই লম্বা হয়েছিল, কারণ ময়ূরীরা লম্বা পুচ্ছ সম্পন্ন ময়ূরের প্রতিই আকৃষ্ট হত। এই প্রসঙ্গে আবারও মার্গুলিস ও সেগানের বইএর ১০ পৃঃ থেকে একটা উদ্ধৃতি দেয়া যাকঃ

“Technology, civilization cannot distance us from our animal selves, but instead accentuate them. Trendy glasses, epaulets etc are similar to tailbones of peacocks”

(“প্রযুক্তি, সভ্যতা আমাদেরকে আমাদের পশুত্ব থেকে খুব দূরে সরাতে পারে না, বরং তা আরও জোরাল ভাবে সেটা প্রতীয়মান করে। সৌখীন চশমা, স্কন্ধালঙ্কার ইত্যাদি ময়ূরের পুচ্ছের মতই”)

শুনতে খারাপ লাগলেও এটা সত্যি যে প্রেমে ছলনা বা বিশ্বাসঘাতকতা, ঈর্ষা ও ধর্ষণ এর উৎস ও বিবর্তনে নিহিত এবং বিবর্তনী মনোবিজ্ঞানীরা এটা নিয়েও গবেষণা করেন। যেমন বিবর্তনী

মনোবিজ্ঞানী থর্নহিল ও পামার তাঁদের "ধর্ষণের প্রাকৃতিক ইতিহাস" (The Natural History of Rape - Thornhill and Palmer) বইএ ধর্ষণের উৎসকে বংশাণুর সর্বাধিক বিস্তারের একটি বিবর্তনজনিত অভিযোজনীয় কৌশল(Evolutionary Adaptive Strategy) হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। প্রত্যাশিতভাবেই তাঁরা ভুল বোঝাবুঝির ও সমালোচনার স্বীকার হন। কিন্তু তাঁদের সমালোচকরা সুপরিচিত "হয় কে উচিত" হেতু দোষ বা প্রকৃতিবাদী হেতু দোষে (Is ought or Naturalistic Fallacy) ভুগেছিলেন, যে হেতু দোষে মানুষ প্রকৃতিতে যাহা ঘটে কেউ তার বর্ণনা দিলে ভুল করে ধরে নেয় যে বর্ণনাকারী উক্ত ঘটনা যে ঘটা উচিত বা নৈতিকভাবে সঙ্গত সেটাই বলতে চাইছে। আসলে মোটেই তা নয়। নৈতিকতা বা উচিৎ অনুচিতের বিচার বিজ্ঞান/বিজ্ঞানীরা করেন না। থর্নহিল ও পামার ও সেটা করেননি। তাঁরা কখনই ধর্ষণ যে নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য তা বলেননি বা ইঙ্গিতও করেননি। এই প্রসঙ্গে এটাও বলে রাখি যে ধর্ষণের বিরুদ্ধে মানুষের গড় নৈতিক চেতনাবোধ ও সেই একই বিবর্তনজনিত অভিযোজনের কারণেই সৃষ্ট। মন্দের প্রবৃত্তি আর একই সাথে মন্দের বিরুদ্ধে প্রবৃত্তি হল বিবর্তনের একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য। ধর্ষণের সঙ্গে এই যে বিবর্তনীয় অভিযোজনের ইতিহাসের যোগসূত্র আছে সেই কথা প্রখ্যাত জীববিজ্ঞানী ম্যাট রিড্‌লীও তাঁর বই "গুণের উৎস(Origin of Virtues)"এ বলেছেন। এর উল্লেখ পাওয়া যাবে স্নায়ুবিজ্ঞানী লেজলী রজারস্ এর বই "Sexing the Brain" এর ৪৫ পৃঃ এ যেখানে ম্যাট রিড্‌লীর "ধর্ষণ বিবর্তনের দিক দিয়ে অভিযোজ্য" এই উক্তিটি উদ্ধৃত করা হয়েছে। "The Science of Sex(যৌন বিজ্ঞান)" নামক টিভি সিরিজের ধারাবর্ণনাকালে অভিনেত্রী ক্যাথলীন টার্নার বলেন প্রতারণা আমাদের বংশাণুতে। কাজেই নিশ্চয়ই অতীতে তার এক বিবর্তনীয় সুবিধা ছিল। প্রচুর পরিমাণ শুক্রের অধিকারী হওয়ার দরুন অতীতের পুরুষদের জন্য যত বেশি সম্ভব সন্তানের পিতা হবার এক বিবর্তনীয় সুবিধা ছিল। এখানে বলা দরকার মানুষের শুক্রাশয় অতীতে শারীরিক অনুপাতে বড় ছিল এখনকার চেয়ে। এটা নৃতাত্বিকভাবে প্রতিষ্ঠিত। এর বিপরীতে মাসে একটি ডিম্বাণুর অধিকারী হয়ে স্ত্রীরা পরকীয়া প্রেমের দিক দিয়ে কম সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল, তবুও স্ত্রীদের মধ্য পরকীয়া প্রেম বা বহুচারিতা দেখা যায় এখনও। কাজেই তারও নিশ্চয় কোন সুবিধা ছিল অতীতে। আর সেই সুবিধাটি হল পরকীয়া প্রেমের মাধ্যমে তার সন্তানের জন্য অধিকতর সংস্থান বা জোগাড় সংগ্রহ করা। আবারও শুনতে খারাপ হলেও এটা বিজ্ঞানের কঠিন সত্য । কাজেই দেখা যাচ্ছে অতীতে পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েরই জন্য পরকীয়া যৌনাচারে বংশাণুগত সুবিধা ছিল। এটা এখনও বাস্তব সত্য, ভিন্ন মাত্রায় হলেও। বিজ্ঞানের এই কঠিন বাস্তবের উল্লেখ পাওয়া যাবে জোন এলিসন রজার্স এর বিশাল গবেষণা গ্রন্থ "Sex: A Natural History" এর ২১৫ পৃষ্ঠায়ঃ

"Deception appears to be necessary and therefore built into our sexual biology"

("প্রেমে প্রতারণা করা প্রয়োজনীয় বলে প্রতীয়মান হচ্ছে এবং সেহেতু এটা আমাদের যৌন জীববিজ্ঞানের সাথে একাকার হয়ে গেছে")

পাঠকদের আবারও "হয় কে উচিৎ" মনে করার হেতু দোষের বিরুদ্ধে সতর্ক করা দেয়া হচ্ছে। প্রকৃতিতে যা ঘটে বা ঘটাবার প্রবৃত্তি বিদ্যমান তার বিপরীত ঘটাবার তাড়না বা প্রবৃত্তিও প্রকৃতিতেই বিদ্যমান। এই দুই তাড়নার টানাপোড়েনের মাধ্যমেই বিবর্তন একটা স্থিতিশীলতা আনয়ন করে।

মজার ব্যাপার এই যে বিবর্তনী মনোবিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে সব প্রজাতিতেই নারীর সতীত্বহীনতার(Infidelity) মাত্রার সঙ্গে পুরুষের শুক্রের পরিমাণ(বা অণ্ডকোষের আয়তন) এর একটা যোগসূত্র আছে।এ ক্ষেত্রে মানুষের অবস্থান হল গরিলা (যার ফাঁকি দেয়ার সম্ভাবনা সর্বনিম্ন, কারণ ক্ষুদ্র শুক্রাশয়) আর শিম্পাঞ্জীর(যার একাধিক সঙ্গমসাথী থাকার সম্ভাবনা সর্বাধিক, কারণ বিশাল শুক্রাশয়) মাঝামাঝি। এ যোগসূত্রের কথা প্রসঙ্গে পূর্বোল্লেখিত টিভি সিরিয়ালে ও এলিসন রজার্স্ এর "যৌনতাঃ প্রাকৃতিক ইতিহাস" বইএর ৩৩৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছেঃ

"Men's relatively large testes are a solid evidence that women in evolutionary history were promiscuous"
("পুরুষের অপেক্ষাকৃত বড় শুক্রাশয় এটারই অকাট্য প্রমাণ দিচ্ছে যে নারীরা বিবর্তনের ইতিহাসে বহুচারিণী ছিল")

বিবর্তনী মনোবিজ্ঞানের গবেষণার ফলে আমরা আরও জানতে পারি যে মানব প্রজাতি শতকরা একশ ভাগ একগামিতার জন্য বিবর্তনগত ভাবে অভিযোজ্য(Adaptive) নয়। জীববিজ্ঞানী মেরেডিথ স্মল তাঁর "এর সাথে প্রেমের কি?(Whats Love got to do with it – Meredith Small)" বইএর ১৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন "এটা প্রতীয়মান যে নারী এবং পুরুষেরাও জীবতাত্ত্বিকভাবে একগামিতার জন্য তৈরী নয়" এর সমর্থনে তিনি উল্লেখ করেন যে প্রাইমেটবর্গের (যার মধ্যে মানুষ অন্তর্ভুক্ত) ২০০ প্রজাতির ১৪ শতাংশই কেবল একগামী।

নৃতাত্ত্বিক ও বিবর্তনী মনোবিজ্ঞানী হেলেন ফিশার তাঁর "প্রেমের স্বরূপ(The Anatomy of Love)" বইএর ১৫৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেনঃ
"From a darwinian perspective, however, there were advantages to serial monogamy millenia ago". From a darwinian perspective, having children with more than one partners often make genetic sense"
(ডারুইনীয় দৃষ্টিকোণ থেকে অবশ্য দেখা যায় যে লক্ষ লক্ষ বছর আগে অনুক্রমিক একগামিতার সুবিধা ছিল। ডারুইনীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে একাধিক সঙ্গমসাথীর সাথে সন্তান জন্ম দেয়া বংশাণুগত ভাবে অর্থবহ ছিল")

এটাও জানা গেছে যে বহুগামিতার সাঙ্গে পুরুষ ও নারীদের দেহের আয়তনের অনুপাতের একটা যোগসূত্র আছে। মানুষের ক্ষেত্রে এটা অল্পমাত্রার বহুগামিতার নির্দেশ করে। এই প্রশ্নে মেরেডিথ স্মল তাঁর পূর্বেল্লিখিত বইএর ২০ পৃষ্ঠায় বলে যে দৈহিকভাবে নারীরা পুরুষের ৮০% যা অল্পমাত্রার বহুগামিতার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। এলিসন রজার্স্ ও তাঁর পূর্বেল্লিখিত বইএর ৩৩৮ পৃষ্ঠায় এই প্রসঙ্গে লিখেছেন যে এসব কিছুই প্রমাণ করছে মানুষ অন্তত ১০০% একগামিতা বা ১০০% হারেম প্রথা, কোনটার জন্যই পরিকল্পিত হয়নি।

ঈর্ষার উৎপত্তিও বিবর্তনের কারণেই। যেমনটি ডেভিড বুস তাঁর বই "ভয়ঙ্কর আবেগঃ ইর্ষা কেন প্রণয় ও যৌনতায় প্রয়োজন(The Dangerous Passion: Why Jealousy Is Necessary in Love and Sex") তে লিখেছেন ও পূর্বেল্লিখিত টিভি সিরিয়ালটিতে বলেছেন আমরা আজ যে এখানে আছি তার কারণ আমাদের পূর্বপুরুষেদের মধ্যে ইর্ষা ছিল। আর যাদের মধ্যে ছিল না

তাঁরা কোন উত্তরসূরী রেখে যান নি। অবশ্যই এর অর্থ এই নয় যে এখনও সবার মধ্যে ইর্ষা থাকতে হবে। বিবর্তনের কৌশল সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয়, এছাড়া বিবর্তনের কৌশলজনিত যে কোন মানবিক বৈশীষ্ট্য মানুষের মধ্যে পারিসাংখ্যিক অর্থে বিরাজ করে, কারও কম, কারও বেশী।

যৌন নির্বাচনের এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল শরীরের গন্ধ। আমাদের প্রত্যেকের শরীরে আমাদের আঙ্গুলের ছাপের মতই অন্যের থেকে আলাদা নিজস্ব এক গন্ধ আছে, যা বিবর্তনীয় যোগ্যতার(Evolutionary Fitness) এর পরিমাপক। মার্গুলিস ও সেগান তাঁদের পূর্বেল্লিখিত বইএর ১৭৯-৮০ পৃষ্ঠায় এর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁরা বলেন যে শরীরের গন্ধই শরীরের প্রতিরোধ তন্ত্রের (Immune System) সুসাস্থ্যের প্রদর্শক। তাঁরা একটি পরীক্ষার কথা লিখেছেন মেয়েদের দ্বারা ছেলেদের ঘর্মযুক্ত টি শার্ট শোঁকার অনুকুল প্রভাবের কথা বলা হয়েছে। এর বিবর্তনগত ঐতিহাসিক কারণ হিসেবে তাঁরা উল্লেখ করেছেন যে আমাদের স্তন্যপায়ী পূর্বপুরুষেরা আদিম যুগে নিশাচর জীব ছিল। কাজেই তখন পরস্পরের সঙ্গী নির্বাচনের জন্য তাদেরকে শোঁকার উপরই প্রধানত নির্ভর করতে হত। হেলেন ফিশার তাঁর পূর্বেল্লিখিত বইএর ৪২ পৃষ্ঠায় লিখেছেনঃ

"Male essence(sweat) helps maintain regularity of female menstrual cycle. Hence females's (unconscious) attraction to male smell may be evolutionarily caused. The reason males now use deodorants and women prefer them may be culturally conditioned by the aggressive selling/ advertizing of producers and making perspiration is equaled to uncleanliness."
(পুরুষের গন্ধ(ঘাম) মেয়েদের ঋতুচক্রকে স্বাভাবিক রাখতে সহায়তা করে। সেজন্যই ছেলেদের ঘামের গন্ধের প্রতি মেয়েদের(অবচেতন) আকর্ষণ খুব সম্ভবত বিবর্তনজনিত। পুরুষদের সুগন্ধী ব্যবহার করার ও মেয়েদের তা পছন্দ করার কারণ হল পণ্য উৎপাদনকারীর বিজ্ঞাপকদের আগ্রাসী সাংস্কৃতিক মগজ ধোলাই যার দরুন ঘাম হওয়াকে অপরিচ্ছন্নতার সঙ্গে এক করে দেখা হয়।)

জোন রজার্স্ ও তাঁর বইএ ২৫১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন মেয়েরা যে পুরুষের MHC বংশাণু তাদের সেই একই বংশাণু থেকে সবচেয়ে বেশি ভিন্ন সেই পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এটা যাচাই করা হয়েছে একটা পরীক্ষার মাধ্যমে, ছেলেদের বগলে টি-শার্ট চুবিয়ে তা মেয়েদেরকে দিয়ে শোঁকানর দ্বারা। বলাই বাহুল্য যে এই শোঁকার দ্বারা MHC বংশাণুর সনাক্তকরণ অতঃপর পছন্দ বা নির্বাচন করা, তা বিবর্তনের দ্বারা সৃষ্ট এক অবচেতন সহজাত প্রবৃত্তির মাধ্যমে হয়, সচেতন সিদ্ধান্তের দ্বারা নয়।

বিজ্ঞানীরা যে হর্মোনের কারণে পুরুষদের দেহে এই বিশেষ ও স্বকীয় গন্ধের সৃষ্টি হয় তাকে সনাক্ত করেছেন। এর নাম এন্ড্রস্টেরন(Androsterone). সাধারণভাবে এই গন্ধসৃষ্টিকারী হর্মোন কে ফেরোমন Pheromone বলা হয়। আর যে অংগ দিয়ে মেয়েরা এন্ড্রস্টেরন কে শুঁকতে পারে সেটাও সনাক্ত করেছেন। এটাকে VNO (Vomeronasal organ) অঙ্গ বলে। নাসিকা নালীর বেশ ভেতরে এটা অবস্থান করে। এটা প্রমাণ করে যে আর সব জন্তুর মত মানুষও শোঁকার মাধ্যমে সঙ্গী বাছাইএর কাজটি করে, অবশ্য মানুষের বেলায় এটা খুবই সূক্ষ্ম

ভাবে হয়। আবার স্মরণ করিয়ে দেই যে এই শোঁকার কাজ প্রবৃত্তিগতভাবে ঘটে, সচেতনভাবে ঘটে না, মেয়েরা এই গন্ধ সম্পর্কে সচেতনভাবে অবগত হয় না। আর একটা ব্যাপার পরিস্কার করে দেয়া উচিৎ যে পুরুষদের ঘামের যে খারাপ গন্ধ মেয়েরা বা সবাই সচেতনভাবে অবগত সেটা এন্ড্রস্টেরনএর গন্ধ নয়, সেটা তার ঘামের ব্যাক্টেরিয়া পচনের দ্বারা সৃষ্ট, যা আবহাওয়ায় ছড়ায় কিছু সময়ের জন্য। এই গন্ধটি আমরা আমাদের মস্তিষ্কের ঘ্রাণ স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যস্থতায় পাই। কিন্তু ফেরোমোনের গন্ধ খুবই সূক্ষ্ম, সেটা সচেতনভাবে পাওয়া যায়না, সেটা সর্বদাই দেহ থেকে নির্গত হচ্ছে ঘামের দ্বারা, তা যত পরিস্কার পরিচ্ছন্নই থাকুক না কেন পুরুষেরা, আর এই গন্ধটা মেয়েরা পায় প্রবৃত্তিগতভাবে, ঘ্রাণ স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যস্থতায় নয়, সরাসরি VNO অঙ্গের মাধ্যমে।

মানুষ প্রজাতিতে মেয়েদের গোপন বা লুক্কায়িত ডিম্বধারণ(Cryptic Estrus, Concealed Ovulation) এর কারণও বিবর্তনে নিহত। কোন্ সময়ে স্ত্রীরা গর্ভধারণে সক্ষম সেটা পুরুষের পক্ষে জানা সম্ভব না বলে সে সর্বদাই তার স্ত্রীর নিকটে থাকে, তার স্ত্রী যখন গর্ভধারণে সক্ষম নয় সেই সময়েও, পাছে তার স্ত্রী দ্বিচারিণী হয়ে অন্যের দ্বারা গর্ভধারণ করে, আর পরিণামে তাকে অন্যের ঔরসজাত সন্তান পালন করতে হয়, এই ভয়ে। যদি পুরুষেরা জানতে পারত কোন সময়ে মেয়েরা গর্ভধারণে অক্ষম তাহলে সেই সময়ে সে পরকীয় প্রেমের জন্য অন্যত্র। ব্যস্ত থাকত। বিবর্তনের বিধান এটাতে বাধ সাধে। নিকট সান্নিধ্যে থাকার ফলে তার সাথে তার স্ত্রীর ও সন্তানের বন্ধন জোরাল হয়, যা বংশবিস্তারের সয়হায়ক, আর যা বিবর্তনের আশু লক্ষ্য। বিবর্তনের এই দিকটি নিয়ে মার্গুলিস ও সেগান তাঁদের বইএর ১৯৭ পৃষ্ঠায় আলোচনা করেছেন। যৌনবিজ্ঞানের টিভি সিরিজেও এটা নিয়ে ধারাবর্ণনা দিয়েছেন ক্যাথলিন টার্নার।

পুরুষ ও নারীদের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যই যে অন্যের চোখে সৌন্দর্য্য বলে অনুভূত হয়, যার কারণে সে প্রেমে পড়ে এ সত্যটি কে না জানে। এই বৈশিষ্ট্যগুলো আসলে বিবর্তনের দ্বারা প্রোগ্রাম করা, যা যোগ্যতার চিহ্নিতকারক বা নিদর্শক (Fitness marker) হিসেবে কাজ করে। আমেরিকার টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়(অস্টিন শহরে) এর মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক দেবেন্দ্র সিংহএর গবেষণায় দেখা গেছে যে মেয়েদের কোমর ও নিতম্বের মাপের অনুপাত হল তেমন এক যোগ্যতার নিদর্শক, যা সুস্থ গর্ভধারণের যোগ্যতাকে নির্দেশ করে। এর উল্লেখও পাওয়া যাবে জোন রজার্স্ এর বই এবং যৌনবিজ্ঞানের টিভি সিরিজে। কম মানের কোমর/নিতম্বের অনুপাত তারুন্য, গর্ভধারণক্ষমতা(Fertility) এবং সাধারণভাবে সুসাস্থ্যের প্রতীক। বিবর্তনী মনোবিজ্ঞানী ভিক্টর জন্সটন(Victor Johnston) তাঁর "আমরা কেন অনুভব করি? - অনুভূতিবিজ্ঞান(Why We Feel? The Science of Emotions)" বইএর ১৪৮ পৃষ্ঠায় বলেন যে মেয়েদের কোমর ও নিতম্বের মাপের অনুপাত ৭/১০ হলে এন্ড্রোজেন ও এস্ট্রোজেন হর্মোনের যে অনুপাত গর্ভধারণের জন্য সবচেয়ে অনুকুল সেই অনুপাতই ধারণ করে। এরকম আরেকটি নিদর্শক হল সুডৌল ওষ্ঠ। তাই দেখা যাচ্ছে সৌন্দর্য্যের উপলব্ধি ও যৌন আকর্ষনের সাথে গর্ভধারণক্ষমতার একটা সম্পর্ক আছে। পুরুষদের বেলায় একটি যোগ্যতার নিদর্শক হল মুখাবয়বের প্রতিসাম্য। মেয়েরা প্রতিসাম্যপূর্ণ মুখের অধিকারী পুরুষদের দিকে বেশি আকৃষ্ট হয়। এর উল্লেখ পাওয়া যাবে লেজলী রজার্সের পূর্বেল্লিখিত বইএর ৪৯-৫৮ পৃষ্ঠায় যেখানে তিনি পূর্বেল্লিখিত বিজ্ঞানী থর্নহিলের (Randy Thornhill) গর্ভধারণ বনাম সৌন্দর্য্য ও প্রতিসাম্যের তত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন।

শৈল্পিক সৃজনশীলতা যেমন সঙ্গীত, চিত্রাংকন, কান্তিবোধ, রসজ্ঞান,ক্রীড়ানৈপুণ্য, মননশীল ক্রিয়াকর্ম এসব গুলিই যৌন নির্বাচনের ফলে সৃষ্ট বলে কোন কোন বিবর্তনী মনোবিজ্ঞানীরা, বিশেষ করে ম্যাট রিডলী মনে করেন। তাঁদের মতে মানুষের মস্তিষ্কের অপেক্ষাকৃত বড় আকার ধারণ করার কারণই হল যৌন নির্বাচনজনিত চাপ। ব্যয়বহুল অংগ যেমন মস্তিষ্ক (যা প্রচুর তাপ ব্যবহার করে) যোগ্যতার নির্দেশক হিসেবে কাজ করে। এ বিষয়ে পথিকৃৎ কাজ করেছেন জেফ্রি মিলার (Geoffrey Miller) যিনি একটি অতি সুপাঠ্য বই "সঙ্গমী মনঃ কেমন করে যৌন নির্বাচন মানব প্রকৃতিকে গড়েছে(The Mating Mind: How Sexual Choice Shaped the Evolution of Human Nature) তিনি সেখানে এই যুক্তি দেন যে মেয়েরা উপরে উল্লিখিত গুন বা বৈশিষ্ট্যগুলিকে যোগ্যতার নির্দেশক হিসেবে সনাক্ত করে এবং এই নির্দেশকগুলিকে বিচার করার ক্ষমতার জন্য তাদের মস্তিষ্কও বিবর্তনের দ্বারা সজ্জিত হয়েছে। তিনি আরও যুক্তি দেন যে এই গুনাবলিসমূহের কোন স্পষ্ট উদ্বর্তন সুবিধা না থাকা সত্বেও এগুলি যে এখনো টিকে আছে তাতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে এগুলি অতীতে এবং এখনো নিশ্চয় কোন না কোন প্রজননগত সুবিধা (Reproductive Advantage) প্রদান করে। রোমান্টিক স্বভাব যেমন জটিল চিত্রশিল্পের সৃষ্টি অতীতে আমাদের পূর্বপুরুষদের অধিকতর আহার সংগ্রহে বা শিকারী জন্তুর কবল থেকে রক্ষা করতে নিশ্চয় সাহায্য করে নি। কাজেই এটা নিশ্চয় আদিম পুরুষের যোগ্যতানিদর্শক হিসেবে কাজ করেছে যার মাধ্যমে স্ত্রীরা তাদের পুরুষ সঙ্গীদের বেছে নিত মিলনের জন্য। অবশ্য আদিম কালের ঐ শৈল্পিক গুণাবলী অনেক সরল ও নিম্ন মানের ছিল যা কালের সাথে জটিল ও উন্নততর হয়ে আধুনিক পর্যায়ে এসেছে। যেহেতু মস্তিষ্কের বিবর্তন ও তজ্জাত শৈল্পিক গুণাবলী যৌন নির্বাচনের কারণে ঘটে সেহেতু কোন কোন বিবর্তন মনোবিজ্ঞানী, যেমন ম্যাট রিড্‌লী মস্তিষ্ককে একটি গুরুত্বপূর্ণ যৌনাঙ্গ বলে অভিহিত করেছেন।

প্রেম ও যৌনতার আলোচনা করতে গেলে লিঙ্গ যুদ্ধের ও মিলনসঙ্গী নির্বাচনের প্রতিযোগিতার কথা না বল্লেই নয়।জীব বিজ্ঞানীরা সঙ্গী নির্বাচনের প্রতিযোগিতার উৎস খুঁজেছেন শুক্রে(বীর্যে)। রবিন বেকার এ নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন কিভাবে শক্রাণুগুলো একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয় ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করার লক্ষ্যে। ঐ প্রতিযোগিতা পুরুষদের মধ্য সঙ্গীনী নির্বাচনের প্রতিযোগিতারি একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ। লিঙ্গের মধ্যকার যুদ্ধের (Battle of the Sexes) বিষয়ে ম্যাট রিডলী তাঁর "Red Queen" বইএ বলেন এর উৎপত্তি হয়েছে বিবর্তনের আদিম যুগে এককোষী জীবের পুরুষ ও স্ত্রী জননকোষের মধ্যকার প্রতিযোগিতার কারণে, যার ফলে পুরুষ ও নারী লিঙ্গের পৃথকীকরণ ঘটেছে । এর বিশদ বর্ণনায় না গিয়ে এখানেই ইতি টানছি লেখাটিকে আর দীর্ঘায়িত না করে । উৎসাহী পাঠকেরা বইটি পড়তে পারেন।